মহাত্মা গান্ধীর শিক্ষা

অধ্যাপক সুপ্রিয় মুন্সী

সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার বিজয়িনী প্রখ্যাত ঔপন্যাসিক পার্ল বাক্ একবার প্রখ্যাত সমাজ বিজ্ঞানী ও মহাত্মা গান্ধীর এক সময়ের সচিব (১৯৪৬-৪৭) অধ্যাপক নির্মল কুমার বসুকে বলেছিলেন যে "মহাত্মা গান্ধী বোধ হয় মনুষ্যকুলের একজন শ্রেষ্ঠ শিক্ষক ছিলেন"। ১৯৩১ সালে গান্ধীজী জখন ২য় গোল টেবিল বৈঠকে যোগ দিতে ইংল্যান্ডে যান তখন 'অদ্বিতীয় দেশপ্রেমিক' সুভাষ চন্দ্র বসু (তখনও নেতাজী হননি) গান্ধীজীকে 'বিশ্বের শিক্ষক' হিসাবে বর্ণনা করেছিলেন।

শাশ্বতভাবে শিক্ষার সংজ্ঞা দিতে গিয়ে অনায়াসেই বলা যায় সেই পদ্ধতির কথা যা ব্যক্তির শরীর, মন ও আত্মার উদ্বোধনের সহায়ক। কিংবা সেই পদ্ধতি, যার সুষ্ঠ প্রয়োগের ফলে ব্যক্তি-মানুষ সামাজিক প্রক্রিয়ায় অংশ নিতে উদ্বুদ্ধ হয় এবং সামাজিক শোষণের বিরুদ্ধে ব্যক্তির আত্মরক্ষায় বর্ম হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এই দুয়ের বাস্তবিক প্রকাশ মহাত্মা গান্ধীর শিক্ষা চিন্তায় পরিলক্ষিত হয়।

একথা ঠিক অন্যান্য তাত্বিকদের সঙ্গে তুলনায় গান্ধীজীর শিক্ষার মডেলে একটি মৌল পার্থক্য রয়েছে। গান্ধীজীর বিশেষত্ব এখানেই যে শোষণ ও কর্তৃত্ব বিহীন অহিংস সত্য সমাজ গঠনের লক্ষ্যে তিনি জীবজগৎ এবং শিক্ষা সহ জীবনের সকল ক্ষেত্রেই একটি সার্বিক দৃষ্টিভঙ্গী বহন করতেন। এরূপ সমাজে 'কর্ষিত' বা 'সংস্কৃতিবান' ব্যক্তি মানুষকে সমাজের উপযুক্ত করে গড়ে তোলার প্রতি সবিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। মহাত্মা কখনোই চাননি কেবল শিক্ষার জোরে পৃথিবীতে উচ্চকোটির মানুষেরা সামাজিক ক্ষমতা করায়ত্ত করে রাখবে এবং শিক্ষা না থাকার দোষে এক 'বিরাট' সংখ্যক মানুষ সামাজিক ক্ষেত্রে চিরকাল 'বহিরাগত' হয়েই কাটিয়ে দেবে। সুতরাং মাহাত্মার বহুধা বিস্তৃত ভাবনার মধ্যে শুধুই বাস্তবতার ছাপ ছিল না অবশ্যই ছিল এক চিরনতুন সৌরভ। তাঁর ভাবনায় এই নতুনত্বের উপস্থিতি চিরায়ত ধারণাগুলিকে নতুন মাত্রা দিতে সচেষ্ট থেকেছে। হাতে-কলমে কাজ করার যথার্থ অভিজ্ঞতার জোরেই তিনি শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্যকে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন এবং সেজন্যই আগ্রহী হয়েছিলেন শিক্ষার বিষয়গত ও পদ্ধতিগত দিককে নতুনরূপে সাজিয়ে তুলতে। এর ফলে শিক্ষা শুধু যে সর্বজন গ্রাহ্য বা বোধ্য হবে তাই নয়, সবশ্রেণীর মানুষও একই পদ্ধতির অধীনে আসতে পারবে। পাশাপাশি এর সফল প্রয়োগ দ্বারা অর্থনৈতিক, শিক্ষাগত, জাতিগত ও বর্ণগত বৈষম্যকে দূর করে এক সর্বোদয় সমাজও অর্জন করা যাবে।

এই পদ্ধতিকেই তিনি 'মূল শিক্ষা' বা Basic Education বলে অভিহিত করেছেন যা সমাজে 'কর্ষিত' মানুষকে কাঙ্খিত উন্নতির পথে নিয়ে যাবে। সমাজে 'কর্ষিত' মানুষের প্রয়োজন চিরকালের। কারণ মাহাত্মার দেখা সর্বোচ্চ ক্ষমতা কাঠামো অর্জনের পথে কিছু মূল্য বা ত্যাগ স্বীকার করা এই মানুষদের দ্বারাই সম্ভব। গান্ধীজী বলছেন, মূল শিক্ষার সূচনা হবে পিতা-মাতার দ্বারা কারণ তাঁরাই শিশুর প্রথম শিক্ষক। অপর একটি ক্ষেত্রে তিনি বলছেন, এই শিক্ষা অর্জনের কাল জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত ব্যাপ্ত।

গান্ধীজীর শিক্ষা ভাবনা তাঁর সঠিক বিপ্লবী ভাবনার অবিচ্ছেদ্য অংশস্বরূপ। শুধু ভাবনাতেই নয়, কাজের ক্ষেত্রেও তিনি ছিলেন একজন সম্পূর্ণ বিপ্লবী, যিনি ধ্বংস ও পুনর্গঠনের কাজ একই সাথে করতে চেয়েছিলেন।

গান্ধীজী যখন বিদেশী চাকুরী, আদালত বা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলি বয়কট করার জন্য মানুষকে উদ্বুদ্ধ করছিলেন, সে সময়ই সর্বপ্রথম বিকল্প ব্যবস্থা হিসাবে 'মূল শিক্ষাকে' রূপ দিতে তৎপর হন। গান্ধীজী এ সম্পর্কে সচেতন ছিলেন যে শিক্ষার জন্য ব্যয়িত অর্থের আনুকুল্যের অভাবই অনেককে শিক্ষা পেতে বঞ্চিত করে। সে কারণে তিনি শিক্ষাকে 'স্বনির্ভর' করতে আগ্রহী ছিলেন।

তিনি আশা করেছিলেন যে এরূপ শিক্ষার দ্বারা প্রত্যেক মানুষ স্বীয় ব্যক্তিজীবনকেও স্বনির্ভর করতে পারবে। তিনি শিক্ষার ভূমিকাকে প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থার 'সংস্থাপক' রূপে সীমাবদ্ধ না রেখে একে নতুন সমাজ ব্যবস্থার 'নির্মাতা' রূপে নির্দিষ্ট করতে চেয়েছিলেন। তিনি অনুমান করেছিলেন প্রচলিত ব্যবস্থায় 'শিক্ষিত সুবিধাপ্রাপ্ত'দের সঙ্গে 'সুবিধাহীন অশিক্ষিত'দের সংঘর্ষ অনিবার্য। তাই শিক্ষাকে চাকুরী প্রাপ্তির যোগ্যতা রূপে তুলে না ধরে তিনি একে অন্ত্যজ মানুষের উন্নতি ও ক্ষমতা আহরণের পথের দিশা রূপেই দেখতে চেয়েছিলেন। এই ভাবনা বাস্তবায়িত হতে পারলেই সংঘর্ষ, শোষণ, প্রতিযোগিতা, ক্ষমতা, লাভ বা লোভনির্ভর সমাজের ধ্বংস ত্বরান্বিত হবে এবং সম্ভব হবে এক স্বপ্নের অহিংস সমাজের নির্মাণ।

সেক্ষেত্রে শিক্ষা-ব্যবস্থার পাঠক্রমেরও পরিবর্তন প্রয়োজন। শুধু তথাকথিত অর্থেই নয়, এই পাঠক্রমে সত্যবাদিতা, স্বাস্থ্য, পুষ্টি, সহযোগিতা, পিতা-মাতার কাজে সহায়তা, সমাজ সেবা এবং অবশ্যই স্ব-নির্ভরতার মত বিষয়গুলিকে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। এই বিষয়গুলি সম্পর্কে শিক্ষিত হলেই একজন ব্যক্তি ভবিষ্যত সমাজে তার উপযুক্ত ভূমিকাকে প্রয়োগ করতে পারবে। উল্লেখ করা প্রয়োজন, গান্ধীজী প্রাথমিক অবস্থায় শিশুদের মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁর মতে মাতৃভাষার মাধ্যমে বিষয়টির ভিত দৃঢ় হলে, যে কোন ভাষায় জ্ঞান আহরণ সম্ভব।

মহাত্মার স্বপ্নের সমাজকে বাস্তবে রূপ দিতে আমাদের কর্তব্য সমস্ত মানুষের শিক্ষা পাবার সম-অধিকারকে সুনিশ্চিত করা। প্রয়োজন বর্তমান পদ্ধতির আমূল পরিবর্তন। সামগ্রিক উন্নতির পথে উত্তরণের জন্য এক সম্পূর্ণ ভিন্ন ধারার কর্মসূচী রূপায়ণের প্রতি আজ নজর ফেরানো আবশ্যিক।

শিক্ষা সম্পর্কে গান্ধীজীর মডেলকে সার্বিকভাবে বিচার করলে বোঝা যায় যে এর মাধ্যমে তিনি মানুষকে এক 'সত্য সমাজের' জন্য প্রস্তুত করতে চেয়েছিলেন, যে সমাজের মূল বাণী হবে সহযোগিতা। বর্তমান পৃথিবীতে সমস্ত মানুষের জন্য আর্থিক সম্পন্নতা সুনিশ্চিত করা বাস্তবে অসম্ভব। কারণ, প্রচলিত কাঠামোয় রাষ্ট্রের অধীনে রয়েছে পৃথিবীর অধিকাংশ সম্পদের ভোগের মালিকানা।

এমত পরিস্থিতিতে উপযুক্ত শিক্ষাই মীমাংসা হতে পারে। কারণ তখন উৎপাদন ও ভোগ্য সীমার মধ্যে সমীকরণ করা যেমন সম্ভব হবে, তেমনই সম্ভব হবে বেতনহার ও দ্রব্যমূল্যের মধ্যে সৌহার্দ্য বজায় রাখা। বহুমতের ভিত্তিতে নয়, সেদিন 'সত্য সমাজ' পরিচালিত হবে সহমতের ভিত্তিতে। সামাজিক সকল হিংসা উৎসকে উৎখাত করে শান্তি ও গণতন্ত্রের পথকে সুগম করতে সেদিন গান্ধীজীর দেখা শিক্ষাই এক বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করবে।